ধারাবাহিক রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত

স্বামী চেতনানন্দ

পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত এই গানটি স্বামীজী কিন্নর-কণ্ঠে গাইলেন :

''দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটির ঘরে॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয় সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদিপরে॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥

''পরে তিথিপূজার নিয়মানুযায়ী একটি জীবিত মৎস্য বাদ্যোদ্যমের সহিত গঙ্গায় ছাড়া হইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তদিগের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল।''[৬৫]

আমরা ১২৩ বছরের পূর্বের অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব দেখছি বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মাধ্যমে। পুরনো দিনের ওইসব কথা ও কাহিনি আমাদের মনে ঠাকুরের উৎসবের আনন্দ জাগায়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে বা খুব সংক্ষিপ্তকারে প্রকাশ করলে উপভোগ করা যায় না এবং সম্পূর্ণ চিত্রও দেখা যায় না। বিভিন্ন গ্রন্থে স্মৃতিকথা ও পত্রাবলি প্রভৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সুদীর্ঘকাল পরে জন্মোৎসবগুলির যথাসম্ভব পূর্ণচিত্র দর্শনই আমাদের লক্ষ্য।

প্রত্যক্ষদর্শী হরিচরণ মল্লিক ১৮৯৮ সালে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে ঠাকুরের উৎসব প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেছেন।

''এই বাগানে একবার ঠাকুরের জন্মোৎসব। স্বামীজী কানে কুণ্ডল পরেছেন। ছাই মেখে একেবারে শিবটি সেজেছেন। তাঁর ডাকাবুকো চেলা গুপ্ত মহারাজকে বললেন, 'জি.সি.-কে (গিরিশবাবু) গেরুয়া পরা, ছাই মাখা।' একটা জটা ছিল, সেটা পরাতে বললেন, 'দে, দে ওকে ভৈরব সাজিয়ে দে।'

''গিরিশবাবু একটু কিন্তু কিন্তু করছেন। বলছেন, 'আরে, আমার সর্দি হয়েছে যে।' স্বামীজী ছাড়বার পাত্র নন। শেষে তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে ছাই-টাই মেখে গিরিশবাবু হাসতে হাসতে বলছেন, 'তাই তো

অধ্যক্ষ, বেদান্ত সোসাইটি, সেন্ট লুইস

হে নরেন, এখন দেখছি, সর্দি একটু একটু করে কমে যাচ্ছে যে।'

''এই বাগানের ঠাকুরঘর ছিল ছপ্পর ও গোলপাতার চালা। মেজে ও দেওয়াল পাকা সিমেন্ট করা। স্বামীজী সকলকে নিয়ে তার ওপর বসলেন। বললেন, 'এইবার সবাই মিলে ধ্যান লাগাও।' গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁর একটি মর্মস্পর্শী কবিতায় ঠাকুরকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'তব ধ্যান পরম উৎসব।' এইবারের অনুষ্ঠান থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন কি না জানি না।

''শরৎ মহারাজ তানপুরা হাতে গান করছিলেন। স্বামীজী ধ্যানের কথা বলাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তানপুরার আওয়াজ থামালেন। স্বামীজী বললেন, 'তুই থামলি কেন রে?' তখন তানপুরার সুমিষ্ট তারের আওয়াজটুকু শরৎ মহারাজ ছাড়তে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে সকল ভক্তদের ধ্যান চলতে লাগল।

''গুপ্ত মহারাজ এই সময়টায় ঠিক যেন ভৃঙ্গীর মতো একটা ডাণ্ডা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীজী বললেন, 'শালা, খালি কুলিগিরি করবি কি? বোস, বোস, ধ্যান লাগা।' গুপ্ত মহারাজ সঙ্গে সঙ্গেই মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলছেন, 'এ মহারাজ। ধেয়ান তো আতাহি নেহি।' কথামতো বসলেন অবশ্য। স্বামীজী এই সময় নিজে পাখোয়াজ বাজিয়ে স্বরচিত 'খণ্ডন ভববন্ধন' ভজনটি গাইলেন। হরি মহারাজ ঘণ্টা বাজালেন, কেউ বা কাঁসর ইত্যাদি। খুব চমৎকার জমল।

''শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে দিয়ে আমাদের কয়েকজনকে গায়ত্রী সূত্র দেওয়ালেন। লাল কম্বল একখানা গায়ে দিয়ে গড়গড়া হাতে সাক্ষিস্বরূপ সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তখন তামাক খাচ্ছিলেন। ঐভাবে কোন কথা না বলে তিনি সকলের ভেতর শক্তিসঞ্চার করলেন। বাহ্যতঃ তিনি তামাক খাচ্ছিলেন বটে। কিন্তু চোখ দেখে বোধ হলো তিনি আত্মস্থ, ভেতরে ঢুকে রয়েছেন। কাজ হয়ে গেলে, লম্বাপানা কাপড়ে বাঁধা উপনিষদ্ ও শ্রীভাষ্য—বইগুলো আমাদের প্রত্যেকের মাথায় স্বামীজী ঠেকালেন। প্রশান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে বললেন, 'তোদের আজ থেকে বেদে অধিকার করে দিলুম।' স্বামীজী নিজে সকলকে হাতে করে সূত্র দিলেন। সবাই আমরা অব্রাহ্মণ। মাস্টার মহাশয়ের দুই ছেলে—নটি, চারুও ছিল। প্রথমটা মাস্টার মহাশয় একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। ওঁর ছেলেদের সম্বন্ধে স্বামীজী বললেন, 'আপনার ছেলেদেরও এই সঙ্গে হয়ে যাক। আপনার খরচা বাঁচিয়ে দিচ্ছি।' মাস্টার মহাশয় একটু চুপ করে বলছেন, 'তুমি নিজে যদি দাও, তো দাও। আমার আপত্তি করবার কিছু নেই।' স্বামীজী বললেন, 'এ তো আমিই দিচ্ছি।' ''[৬৬]

১৮৯৮ সালের ঠাকুরের জন্মোৎসবের বিবরণ দিয়ে স্বামী প্রেমানন্দ ৬ মার্চ ১৮৯৮ মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখলেন :

''তিথিপূজার দিন সুশীল পূজা ও সুধীর তন্ত্রধারকের কার্য করিয়াছিল। ঐ দিন শতাধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ একটি সুন্দর আরতির গান রচনা করিয়াছে :

খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়,
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমোভঞ্জন হার।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ আরতি তোমার॥

''সকলে সমবেত হয়ে আরতি করা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ মস্তকে জটা, কর্ণে কুণ্ডল, গাত্রে বিভূতি ধারণ করায় এক অপূর্ব্ব শোভা হয়েছিল। আমরা

অনেকেই ঐরূপ সাজিয়াছিলাম।

''রাত্রি ১২টা পর্যন্ত পূজা-হোমাদি হইয়াছিল। ঐ দিন গঙ্গা ও সুরেন মহুলা হইতে একমণ ওজনের দুই ছানাবড়া লইয়া হাজির। স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম্ম কি?'—এ সম্বন্ধে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তোমায় একখানি পাঠাইব।''[৬৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের এই আরাত্রিক গান সম্বন্ধে দুচার কথা বলা প্রয়োজন। বরানগর ও আলমবাজার মঠে ঠাকুরের আরতিকালে কাশীর বিশ্বনাথের আরতিস্তব গাওয়া হত। শ্রীম কথামৃতে লিখেছেন :

''সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে শশী ধুনা দিলেন। অন্যান্য ঘরে যত ঠাকুরের পট ছিল, সেখানে ধুনা দিলেন ও মধুর স্বরে নাম করিতে করিতে প্রণাম করিলেন।

''এইবার আরতি হইতেছে। মঠের ভায়েরা ও অন্যান্য ভক্তেরা সকলে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। ভক্তেরা সমস্বরে আরতির গান সেই সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন :

জয় শিব ওঁকার, ভজ শিব ওঁকার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব হর হর হর মহাদেব॥

নরেন্দ্র এই গান ধরাইয়াছেন। কাশীধামে বিশ্বনাথের সম্মুখে এই গান হয়।''[৬৮]

মনে হয় ঠাকুরের শুভ জন্মদিনে স্বামীজী ওই সংক্ষিপ্ত আরতির গান রচনা করেন এবং পরে আরও সাতটি শ্লোক জুড়ে একটি 'অষ্টপদী' রচনা করেছিলেন। আরাত্রিকটি গাওয়া হয় দুপুরে ভোগারতির সময়। স্বামীজী নিজে পাখোয়াজ বাজিয়ে গান, হরি মহারাজ ঘণ্টা বাজান এবং কেউ কাঁসর ইত্যাদি বাজান।

মহাপুরুষ মহারাজ পরবর্তী কালে এই আরাত্রিকের প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেন :

''আগে মঠে আরতির সময় এ স্তোত্র গাওয়া হত না। তখন 'জয় শিব ওঙ্কার, ভজ শিব ওঙ্কার' ইত্যাদি বারংবার গাওয়া হত। তারপর স্বামীজী নিজে 'খণ্ডন-ভববন্ধন' এই স্তবটি রচনা করলেন, তাতে সুর দিলেন এবং সকলকে নিয়ে গাইতে শুরু করলেন। তিনি নিজেই পাখোয়াজ বাজিয়ে গাইতেন। সে কি অদ্ভুত দৃশ্য! একে তো তাঁর ভৈরবের মত দিব্যকান্তি শরীর; তার উপর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে পাখোয়াজ বাজিয়ে যখন গাইতেন, সে যে কি এক গম্ভীর ভাবের সৃষ্টি হত তা আর কি বলব!''[৬৯]

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থে স্বামীজীর কণ্ঠ ও বাদ্যসংগীতে পারদর্শিতা সম্বন্ধে লিখেছেন :

''বেলুড় মঠের ঠাকুর ঘরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে [আরাত্রিক] গান করেছিলেন স্বয়ং পাখোয়াজ বাজিয়ে। গানটি ধ্রুপদাঙ্গের এবং চৌতালে গঠিত। ধ্রুপদ গান গাইবার সময়ে গায়কের সঙ্গে একযোগে মৃদঙ্গে সঙ্গত করা অতি কঠিন। একাধারে গান ও পাখোয়াজের সাধনায় দুর্লভ সিদ্ধিলাভের অধিকারী প্রতিভাধর ভিন্ন তা সম্ভব নয়। এবং এবিষয়ে বেশি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। একমাত্র স্বনামধন্য যদুভট্ট সম্পর্কে একথা শোনা যায়। সঙ্গীত জগতে বাংলার গৌরব যদুভট্ট আপনার গানের সঙ্গে আপনি মৃদঙ্গে সঙ্গত করতে পারতেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—স্বামীজী।''[৭০]

স্বামী অম্বিকানন্দ স্মৃতিচারণ করেছেন :

''মঠে আরতির স্তব 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন...' স্বামীজী থাকতে কীরূপ হতো জান? সব ঘণ্টা কাঁসরাদি যেমন চৌতালে বাজত, আরতি করতে করতে বাঁ-হাতে ঘণ্টাটিও তেমনি চৌতালে পূজারিকে বাজাতে হতো। বাবুরাম মহারাজ পূজারি। ঐ অবস্থায় অসুবিধা হচ্ছে দেখে তিনি ঘণ্টাটি অপরের হাতে দিয়ে শুধু আরতি করতেন।''[৭১]

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ ঠাকুরের সাধারণ উৎসব (public festival) উদ্‌যাপিত হয় বেলুড়ের পূর্ণচন্দ্র

দাঁ-দের ঠাকুরবাড়িতে। স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ৩০ নভেম্বর ১৮৯৭ লেখেন, ''নিজের জমিতে মহোৎসব করে তবে কাজ—তাতে বুড়োই মরে আর চেঁকড়াই ছেঁড়ে।''[৭২] কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বেলুড়ে গঙ্গার ধারে মঠের জন্য জমি কেনা হল। তা ছিল আম, নারকেল, তাল, কলা, কচুগাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নদীর কিনারায় নৌকা মেরামত হত। খানাখন্দে ভরা এবড়ো খেবড়ো জমিকে সমান ও ব্যবহারযোগ্য করতে ব্যয় হয় প্রায় চার হাজার টাকা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নতুন মঠের জমি ও বাড়ি তৈরির দায়িত্ব নেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ স্বামীজী শশী মহারাজকে লেখেন : ''যে জমি কেনা হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও এখনই ঐ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে, তথাপি রবিবারে উহার উপর আমি কিছু না কিছু করাইব। অন্ততঃ শ্রীজীর ভস্মাবশেষ ঐ দিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লইয়া গিয়া পূজা করিতেই হইবে।''[৭৩]

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি স্বামি-শিষ্য-সংবাদে লিপিবদ্ধ করেছেন :

''আজ নূতন মঠের জমিতে স্বামীজী যজ্ঞ করিয়া ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিষ্য পূর্বরাত্র হইতেই মঠে আছে। ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে—বাসনা।

''প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বামীজী ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পূজকের আসনে বসিয়া পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল-বিল্বপত্র ছিল, সব দুই হাতে এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব দর্শন! তাঁহার ধর্মপ্রভা-বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তিতে ঠাকুর-ঘর যেন কি এক অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অন্যান্য স্বামিপাদগণ ঠাকুর-ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

''ধ্যানপূজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণসহ শিষ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শঙ্খ-ঘণ্টারোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল হাবভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন—'ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটিরই কি।' সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহু কাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।''

''এইরূপ কথাবার্তা হইতে হইতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী স্কন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন।

''অনন্তর স্বামীজী পুনরায় পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হোম করিলেন এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সহায়ে স্বহস্তে* পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। বোধ হয়, ঐ দিন ঐ স্থানে তিনি কয়েকটি গৃহস্থকে দীক্ষাপ্রদানও করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পূজা সমাপন করিয়া স্বামীজী সাদরে সমাগত সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে ইহাকে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়-কেন্দ্র করে রাখেন।' সকলেই করযোড়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন। পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে ডাকিয়া

*স্বামী শিবানন্দ পায়েস রান্না করেছিলেন।

বলিলেন—'ঠাকুরের এই কৌটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কারও আর অধিকার নাই; কারণ আজ আমরা ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছি। অতএব তুই-ই মাথায় করে ঠাকুরের এই কৌটা তুলে মঠে (নীলাম্বরবাবুর বাগানে) নিয়ে চল।' শিষ্য কৌটা স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, কর, আমার আজ্ঞা।' শিষ্য তখন আনন্দিত চিত্তে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কৌটা মাথায় তুলিয়া লইল এবং শ্রীগুরুর আজ্ঞায় ঐ কৌটার স্পর্শাধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে কৌটামস্তকে শিষ্য, পশ্চাতে স্বামীজী, তারপর অন্যান্য সকলে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে স্বামীজী তাহাকে বলিলেন—'ঠাকুর আজ তোর মস্তকে উঠে তোকে আশীর্বাদ করছেন। সাবধান, আজ হতে আর কোনও অনিত্য বিষয়ে মন দিস নে।' একটি ছোট সাঁকো পার হইবার পূর্বে স্বামীজী শিষ্যকে পুনরায় বলিলেন—'দেখিস, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্কে যাবি।'

''এইরূপ নির্বিঘ্নে মঠে উপস্থিত হইয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী শিষ্যকে এখন কথা-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—'ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল।' ''[৭৪]

এখানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামীজীর জীবনীকাররা এই ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮-এর ঘটনার সঙ্গে ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮-এর ঘটনা মিশিয়ে ফেলেছেন। ব্রহ্মচারী প্রকাশ 'স্বামী সারদানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন : ''১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরব্ধ হইয়া দ্রুত কার্য পরিচালনার ফলে নভেম্বরের শেষে নূতন মঠের বাটীঘর প্রভৃতি কার্য শেষ হইয়া যায়। ৯ ডিসেম্বর তথায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা করা হইল এবং স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি গৃহপ্রবেশ করিলেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি নীলাম্বরের বাগানবাটী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট সাধু ব্রহ্মচারী সকলে নূতন মঠে আসিলেন।''[৭৫]

যাহোক, ১৮৯৮ সালের সাধারণ উৎসবের দিন সকালে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সঙ্ঘটিত হয় এবং সারাদিন দাঁয়েদের ঠাকুর বাড়িতে বিরাট করে জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করে উৎসবকে জাঁকিয়ে তুললেন।

এই উৎসবের বর্ণনা নিবেদিতা ১৬ মার্চ ১৮৯৮ ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় লেখেন। সেই প্রতিবেদনের সারাংশের বাংলা অনুবাদ :

''এখানে এই রবিবার সকালে আকাশ সূর্যকিরণে ঝলমল করছিল। কাছে কোন মন্দিরের ঘণ্টা বেজে চলেছিল, শিবের মন্দিরটির ওপর ঝরে পড়ছিল বিশাল গাছটির শুকনো পাতা। বাতাস ছিল জাফরানের গন্ধে ভরপুর।... পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়ি ও উদ্যানের ঘাটে নামবার অনেক আগে থেকেই নৌকায় বসে হাজার হাজার মানুষের কোলাহল এবং কীর্তনাদির রব শুনতে পাচ্ছিলাম।... এত বেশি মানুষের ভিড় হয়েছিল যে, নদীর ঘাট থেকে আমাদের উদ্যানবাড়িটিতে পৌঁছাতে হিমসিম খেতে হয়েছিল।...

''উপস্থিত সকল মানুষই আন্তরিকভাবে আগ্রহী। শত শত বাঙালী যুবক সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল এবং স্বামীজীকে দেখতে পেয়েই তাঁর পিছু নিয়েছিল এবং চিৎকার করছিল 'বক্তৃতা! বক্তৃতা'! উদ্যানের অপর এক অংশে সন্ন্যাসিগণ রাঁধুনি বামুনদের দিয়ে প্রস্তুত খিচুড়ি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করছিলেন। শিশুসহ প্রায় কুড়ি হাজার লোককে সারাদিন ধরে খাওয়ানো হয়। এই বৃহৎ মহোৎসবে মানুষদের শান্তভাব ও শৃঙ্খলাবোধ দেখে বিস্মিত হতে হয়।... কিন্তু উদ্যানের প্রধান আকর্ষণ ছিল একটি সাময়িকভাবে তৈরি মন্দির, যার বেদির ওপর

শোভা পাচ্ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি। মন্দিরের থাম ও ধনুকাকৃতি খিলানগুলি ছিল গাঁদা ফুল দিয়ে ঢাকা। চন্দ্রাতপের কাজ করছিল জালের ন্যায় বোনা যুঁই কুঁড়ির মালার গুচ্ছ, তার মাঝে-সাজে ছিল গোলাপফুল।

''এই মহোৎসব একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সব বাঁধন ভেঙে উঁচু-নিচু, পুরুষ-নারী, আপন-পর সকলে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। গোপালের মার মতো স্বাভাবিক ভক্তি সবাইকে এখানে টেনে এনেছিল, সেই ভক্তির আলোকে সকলেই তীব্রভাবে অনুভব করছিল, সবার মধ্যে একত্ব।''[৭৬]

৬ মার্চ ১৮৯৮ স্বামী প্রেমানন্দ মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন :

''গত রবিবার দাঁ-দের বাগানে মহোৎসব আদি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—প্রায় অন্য বৎসরের তুল্য। ঐদিন নূতন জায়গায় নরেন্দ্র নিজে ঠাকুর লইয়া গিয়া পূজা ও হোম করিয়াছিলেন। এবং পায়সান্ন ভোগ হইয়াছিল। গতকল্য ঐ জায়গাটি ৩৯০০০ হাজার টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে। শ্বেতপাথরের মন্দির ও প্রকাণ্ড বাটী তৈয়ারের আয়োজন হইতেছে। শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে। দেখে শুনে লোকে অবাক হইয়াছে। তাঁর কার্য তিনিই করেন।''[৭৭]

স্বামী অম্বিকানন্দ স্মৃতিচারণ করেন :

''তখন বেলুড় মঠ তৈরি হয়নি। মঠ তখন নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। ১৮৯৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বেলুড়ে দাঁ-দের ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুরের জন্মোৎসব হলো। স্বামীজী দেখতে চললেন; সঙ্গে সাহেব-মেমরা। শামিয়ানা খাটানো আছে। বহু লোক। সকলে স্বামীজীকে অনুরোধ করল, ''স্বামীজী, আজ শুভদিনে আপনি এসেছেন। আমরা আপনার মুখ থেকে দুটো কথা শুনতে চাই।'' স্বামীজী রাজি হলেন। রোদ তাঁর গায়ে পড়ছে দেখে মেমরা রংবেরঙের ছাতা খুলে তাঁর মাথার ওপর ধরল। স্বামীজীর সেই অপূর্ব বলার ঢং ও তেজ দেখলাম। তিনি বাংলায় কিছুক্ষণ বলেছিলেন।''[৭৮]

ক্রমশ

তথ্যসূত্র

৬৫। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, পূর্বকাণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ১১৩-১৪

৬৬। সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২, পৃঃ ২৬০-৬২

৬৭। *স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৬, পৃঃ ১৭১-৭২ এরপর, *স্বামী* [*প্রেমানন্দের পত্রাবলী*]

৬৮। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৬, খণ্ড ২, পৃঃ ১১৪৫

৬৯। স্বামী অপূর্বানন্দ, *শিবানন্দ বাণী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬২, খণ্ড ১, পৃঃ ১৩৪

৭০। দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ১১৭

৭১। স্বামী চেতনানন্দ, *প্রাচীন সাধুদের কথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৯, খণ্ড ২, পৃঃ ১১৫ [এরপর, *প্রাচীন সাধুদের কথা*]

৭২। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৯, খণ্ড ৮, পৃঃ ১৯

৭৩। তদেব, খণ্ড ৮, পৃঃ ২৬

৭৪। *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, পূর্বকাণ্ড, পৃঃ ১১৫-১১৮

৭৫। ব্রহ্মচারী প্রকাশ, *স্বামী সারদানন্দ*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৩৬, পৃঃ ১২৫

৭৬। স্বামী প্রভানন্দ, *রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৮, পৃঃ ২১৭-১৮

৭৭। *স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী*, পৃঃ ১৭২

৭৮। *প্রাচীন সাধুদের কথা*, খণ্ড ২, পৃঃ ১১৬